মনা

লিলি মুখোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ পত্রটি ব্যাগে পুরে চটজলদি বেরিয়ে পড়লাম, শ্রীলেখার বিয়েতে যে বাড়িটি ভাড়া করা হয়েছে সেই ঠিকানায় পৌঁছবার উদ্দেশ্যে। ঠিকানা খুঁজে পৌঁছেও গেলাম। টুকরো টুকরো মন্তব্য কানে এল--- "এ কেমন বিয়ে বাড়ি! উলু নেই, শাঁখ বাজে না, নহবত বসে নি, নেই সানাইয়ের সুরের আলাপ।" একজন মহিলা অতিথি আবার ফিস ফিস করে উঠল "অথচ রয়েছে মঙ্গলঘট, বরণডালা, ফুলের মালা, অতিথি-অভ্যাগত খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অন্য সব আনুষঙ্গি ক--- সব, প্রায় সব-কিছুই-- ঠিক যেমনটি থেকে থাকে।" একজন মাঝবয়সি অন্য একজনের কানের কাছে মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল--- "কনে সম্প্রদান কে করছে? অম্বা! শ্রীলেখার মেয়ে না?" আমি তাকিয়ে দেখলাম--- হ্যাঁ ঠিক তাই। কন্যা-সমর্পিতা শ্রীলেখার একমাত্র সন্তান অম্বা।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম শ্রীলেখার দিকে, একটু কাছে থেকে দেখার আশায়। অম্বা তার মাকে পাত্রস্থ করতে বসেছে। কানাঘুষো চলছে-- এমন অনাসৃষ্টি, অশাস্ত্রীয় অথচ ঘটপিটা ক'রে বিয়ে নাকি কেউ কখনো দেখে নি। পিত া বা পিতৃস্থানীয় অথবা মা কিংবা নিদেন পক্ষে যে-কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকরা যে-কাজের দাবিদার সেখানে কি না নিজের গর্ভজাত কন্যার হস্তক্ষেপ? এ যে অবাক ক'রে দেবার মতো ঘটনা।

আমি অম্বার পিছনে দাঁড়াতেই আমার কাঁধে যেন কার হাতের চাপ অনুভব করলাম। ফিরে দেখি আমার হাসপাতালের একজন পুরোনো সিস্টার সান্ত্বনা দাস। আমাকে কানে কানে বলছে--- "আমি তোমাকে যার কথা বলেছিলাম সেই গুণ্ডাট ার সঙ্গেই শ্রীলেখার বিয়ে হচ্ছে। ওকে শ্রীলেখার মেয়ে কাকুবাবা বলে।"

অত সাজগোজের মধ্যেও সান্ত্বনাদিকে আমার কেমন যেন কুৎসিত লাগল। তাই কোনো জবাব দিলাম না। শ্রীলেখা পসী এটা সবাই জানে, আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আজকে শ্রীলেখার যে প দেখলাম তাতে মুগ্ধ হয়ে বার বার মনে মনে তুলনা করতে লাগলাম--- কে বেশি সুন্দর--- বেনারসী, গহনা, ফুলের সাজ না শ্রীলেখা? আমাকে মানতেই হল--- শ্রীলেখা। আজকের শ্রীলেখা সৌভাগ্যবতী, পলক্ষ্মী শ্রীলেখা। আবার নিজের কাছে নিজের প্র--- "আচ্ছা! শ্রীলেখার এখন বয়স কত? ওর মেয়ে অম্বার বয়স বাইশ, আর তার সঙ্গে আরো পনেরো যোগ--- কত হল? সাঁইত্রিশ।" দেখে বুঝবার উপায় নেই। তবে বাইশ বছর আগে ওর নামের সামনের 'শ্রী' টি ছিল না। পঞ্চদশী কিশোরী লেখা, অভাগী লেখা, কুলখাকা লেখা, শতেকখোয়াড়ী লেখা, শ্রীহীন লেখা-- শুধু শ্রীলেখা নয়।

আমি আমার মনের পর্দায় প্রোজেকশন ফেলে দেখতে লাগলাম সেই নিষ্ঠুর নির্মম অতীতের চিত্রকে। বৈশাখের দুপুর, ইম ারজেন্সি মেল মেডিকেল ওয়ার্ডে বি-শিফ্‌ট ডিউটিতে ঢুকছি, পিছন থেকে স্ট্রেচার-বয়ের চিৎকার -- "সিস্টার হট যাইয়ে- -- জলদি কর্‌কে জানে দিজিয়ে।" দুজন স্ট্রেচার-বয় একজন রোগীকে নিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে গেল। আমি পাশ কাটিয়ে ডিউটি টেবিলে এসে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই একজন অন ডিউটি ডাক্তার হাঁক দিল-- সিস্টার, ইমারজেন্সি ড্রাগ। মেডিসিন ট্রে হ াতে ছুটে গেলাম। আবার চিৎকার-- সিস্টার, আই ডি ফ্লুইড। ওয়ার্ড-বয় ছিল সীতারাম। ডাক এল, "সীতারাম ফ্লুইড স্ট্যাণ্ড, অক্সিজেন, কটন, ব্যান্ডেজ, অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার।"

আমি আর সীতারাম ছুটোছুটি করে জিনিসপত্র জোগান দিতে থাকলাম। পর পর অনেক রোগীই আসছিল। সেদিন ছিল

ড সেনের আউটডোর অ্যাডমিশন ডে। বিভিন্ন রোগীদের দেখাশুনা আর ডাক্তারের সঙ্গে তাল মেলাতে আমি ও আমার জুনিয়র নার্স আর সীতারাম হিমসিম খেতে লাগলাম। আমি কিন্তু অ্যাটেনশন দিচ্ছিলাম ওই সব রোগীদের প্রতি--- যাদের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। জুনিয়র স্টুডেন্ট নার্স আমার হাতে এক বান্ডিল নতুন রোগীদের টিকিট দিয়ে গেল। এই কাজটা একটু বেশি দায়িত্বপূর্ণ তাই সিনিয়র স্টুডেন্টদেরই করতে হয়। একের পর এক টিকিটের সঙ্গে নাম মিলিয়ে কবজিতে অ্যাড্‌হেসিভ প্লাস্টারের টিকিট আটকাতে লাগলাম। এক সময় নাম এল--- বাসুদেব দাস। কেস্‌ অব ড্রাগ পয়জনিং। রোগীর কপালে আর বেড-১২৫ টিকিটে "পুলিশ কেস" স্ট্যাম্প দেওয়া রোগীর বয়স বাইশ। বাড়ি সোনারপুর।

মাটিতে বেড পাতা, পুরোনো কম্বল, পুরোনো নরম হয়ে যাওয়া রাবার শীট আর ছেঁড়া চাদর দিয়ে, কিন্তু মাথার কাছে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। দুই বেডের মাঝখানে রাখা আছে আই ভি ফ্লুইড স্ট্যান্ড। ঝোলানো আছে ধরনের মাপে যার যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমন ফ্লুইড বোতল। আমি বাসুদেবের কাছেই ছিলাম। সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের দু'পাশে রক্তের দাগ--- বোধহয় স্টমাক ওয়াশ দিতে গিয়ে খুবই ধস্তাধস্তি করেছিল--- তারই চিহ্ন। হরদম বেয়াদবি চিৎকার করছে। বলছে--- "আমার হাতের মাস্‌ল দেখছেন? আমি বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের ছাত্র, একটা মাত্র ব্যথা কমার বড়ি এমন কী ক্ষতি করবে? ডাক্তারবাবু! আমাকে বাঁধবেন বা। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন---বলছি।" এবারে এক ঝটকা মেরে রক্তচক্ষু ক'রে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। বাসুর এত ধমকানিতে ডক্টর-অন-ডিউটি মোটেই বিচলিত হলেন না। সে পর পর বিভিন্ন ধরনের ইন্‌জেকশন ফ্লুইড বোতলে চার্জ করতে লাগল। আমি ডক্টরকে সব রকম জোগান দিয়ে যাচ্ছি। বাসু আমাকে লক্ষ্য করে মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল--- "এই যে সিস্টার! হাতের স্যালাইন খুলে দিন। আমাকে জ্বালাতন করলে আমি লাথি মেরে দেব--- আমার কাছে আসবেন না। ডাক্তারবাবুকে ঘুঁষি মেরে চোয়াল ঘুরিয়ে দেব।"

ডাক্তারবাবুটি এবারেও নীরব। উপরন্তু পাল্‌স, প্রেসার বার বার দেখতে লাগল। অত্যন্ত শান্ত ভাবে এক সময় ডাক্‌ল--- "সীতারাম পেশেন্টের পা বেঁধে দে, পায়ে ফ্লুইড দেব।" আমাকে ডেকে বলল---- "সিস্টার! পেশেন্টের প্রেসার ফল্‌ করছে, ডেকাড্রন নিয়ে আসুন। জলদি! জলদি! দেরি করবেন না। সময় নেই।" বাসুর পায়ে আই ভি দেওয়া হল, বাসু লাফাল না, চেঁচাল না, ঘুষি লাথি সবই বাকি রয়ে গেল। হাত-পা-ঠোঁট একটু একটু করে প্রায় পুরো শরীরটাই নীল হয়ে যেতে লাগল। এত চিকিৎসা, এত নির্যাতন করা-- সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। এক সময় ডাক্তাররা হতাশ হয়ে সীতারামকে বলল--- "সীতারাম! এর বাড়ির লোকদের দেখে যেতে বলো। এখনও লাইফ আছে।"

বাসু একা আসে নি, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া, ক্লাব, ব্যায়ামের আখড়া, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই এক-এক করে এসে দেখে গেল। সবার শেষে এল দু'জন--- একজন অশীতিপর বৃদ্ধা বাসুর পিসি আর অন্য জন? সেই অবগুণ্ঠনবতী যে একটি কাপড়ের পুঁটলি বুকে আঁকড়ে বাসুর পিসির পিছনেই আসছে। প্রথমে বোঝা গেল না। পিসি ঐ পুঁটলি সমেত বৌটিকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল---"ওরে আমার বাসু রে, আমার খাদু রে, আমার বাছা রে, তুই এমনটা কেন করলি রে!"

বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বাসুর পাশে বসে পড়ল। এবার আরো জোড়ে বিলাপ করতে লাগল--- ওরে তুই যে বাপ হয়েছিস, কে দেখবে তোর মেয়ে-বৌকে। আমি আর ক'দিন বাঁচব! তুই চোখ খোল বাপ-- ফিরে আয় বাবা---

আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পিসি হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আমার পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলছিল--- দিদিমণি গো! আমার বাসু যে মুখে রা কাড়ে না, সাড়া দেয় না। ও যে অসার হয়ে যাচ্ছে---- ওকে জাগিয়ে দাও।

আমি পা সরাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। বার বার বলতে লাগলাম---ঐভাবে কাঁদবেন না, অন্য রোগীরা ভয় পাবে---কে কার কথা শোনে। উপরন্তু বছর-পনেরো ঐ ক্ষীনাঙ্গী বধূটিকে প্রায় জোর ক'রে আমার পায়ের উপর ঠেসে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল--- ওরে ও লেখা, ও হতভাগী! দিদিমণির পায়ে পড়ে থাক্‌, তোর সোয়ামীর পেরান ভিক্ষা কর।

অপ্রস্তুত লেখা তার বুকের পুঁটলিটিকে আরো নিবিড় করে চেপে ধরে এ-ভাবে সামলাতে সামলাতে আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল ঠিকই কিন্তু ওর হাত দুখানি ঠিক আগের জায়গাতেই রইল। মুখে কোনো কথা বলল না। বৃদ্ধা পিসি কিন্তু এবারে মরিয়া। লেখাকে টেনে তুলে একেবারে বাসুর পায়ের উপর ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল--- শতেক খোয়াড়ী সোয়ামী খাকী, তোর যে সব কুল গেল--- তুই কি হুঁশ করতে পারছিস না? দুই হাতে ভাতারের পা ধরে রাখ যেন তে

াকে ছেড়ে না-যেতে পারে। যার সম্বন্ধে এত গালমন্দ সে কিন্তু বাসুর পা দু'হাতে ধরতে পারল না। কোনো রকমে বাঁ হাতে বুকের পুঁটলিটিকে আঁকড়ে ডান হাত বাসুর পায়ে ঠেকিয়ে মুখে বিড় বিড় করে বলল---"মনা পড়ে যাবে যে।"
বৃদ্ধার তাড়ন-পীড়নের দাপটে লেখার মাথার ঘোমটাটি খুলে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য আমি যেন কেমন স্থবির হয়ে গেল াম। ব্যস্ততার মধ্যে আমার নজরে আসেনি। ঐ শীর্ণকায় পঞ্চদশীর বুকে যে কাপড়ের পুঁটলিটি রয়েছে আসলে সে জড় নয়। রক্তমাংসে গড়া সম্ভবত মাসখানেক বয়সের একটি তরতাজা প্রাণ। আর সেই প্রাণের উৎস ঐ কিশোরী। একেবারেই গ্রাম বাংলার বালিকা বধূ।
অল্প পরেই বাসুদেবের দেহটা স্থির হয়ে গেল। ডাক্তার তার হার্টবিট পেল না। পাল্‌স, রেসপিরেশন বন্ধ হল। বাসুর মত মৃত্যু হল। বেড-হেড টিকিটে "কেস সীন ডেড" লেখা হল। ডাক্তার চলে যাবার সময় আমাকে বলে গেল-- বডি মর্গে য াবে। পোস্ট মর্টেম হবে। নির্দেশমত অক্সিজেন, ফ্লুইড খুলে দিলাম। সীতারাম ডেড বডিতে চাদর ঢাকা দিল।
বাসুর সঙ্গে যারা সবাই ডুকরে কেঁদে উঠল। বৃদ্ধা পিসিমা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। এত কান্ন াকাটির মধ্যেও একজন কাঁদল না--- সে আর কেউ নয়-- সে বাসুর বালিকা বধূ লেখা। সবাই যখন তাকে কাঁদতে বলছে তখনও সে ঐ জীবন্ত মাংসপিণ্ডটিকে বুকে চেপে মাথা নাড়িয়ে আস্তে আস্তে বলছে--- "মনা কাঁদবে যে।" এর পর ঠিক টুকরো শ্যাওলার মতো ভাসতে ভাসতে সবার পিছে পিছে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বাসুদেব দাস নামে দেহট াকে মর্গে পাঠিয়ে দিলাম।
সময়ের থামা নেই। সে দৌড়ে চলে। চ'লে যেতে লাগল টেপির পড়াশুনা, চাকরির পোস্টিং, সংসার স্বামী-সন্তান সব মিলিয়ে প্রায় বাইশটা বছর। গত পাঁচ মাস আগে আমি এই ইনডাসট্রিয়েল হাসপাতালে পোস্টিং নিয়ে এসেছি। বয়সের সঙ্গে আমার পদ-মর্যাদাও বেড়েছে। বেড়েছে আরো বেশি রকমের দায়িত্ব। সেদিন ও-টিতে কাজ করছি--- একটি ফিমেল জি ডি এ এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল--- "সিস্টার! নমস্কার। ওয়ার্ড কাস্টার বাবু আমাকে আজ থেকে ও-টিতে ক াজ করতে বলে দিল। আমার নামটা রোস্টারে তুলে দেবেন।"
আমি কাজে ব্যস্ত--- ঠিকই, কিন্তু সরাসরি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সাবর্ডিনেটরা খুব একটা সাহস করে না। তাই মুখ তুলে একবার দেখলাম। মেয়েটির কথা এত খোলামেলা অথচ হাত জোড় করে দাঁড়ানোর কায়দায় আমি ধৃষ্টতা খুঁজে পেলাম না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম--- তোমার নাম?
উত্তর এল-- শ্রীলেখা দাস। আবার সে হাত জোড় করে "নমস্কার" বলল। এবার আমাকে বলতেই হল--- "নমস্কার, নমস্ক ার।"
শ্রীলেখা বলল-- 'সিস্টার, ও-টিতে আমি কি কি কাজ করব আমাকে একটু বলে দিন, আমি সব ঠিক করে নেব।"
মনে মনে ভাবলাম--- কেউ চট করে নিজের ইচ্ছায় ও-টিতে কাজ করতে চায় না। অনেকেই ভয় পায়। মনে হল এই জিডি এ মেয়েটিকে তালিম দিয়ে নিলে বেশ কাজের হবে। শুধু মুখে বললাম-- আগামী সাত দিন তোমার নাম ডিউটি রোস্টারে তুললেও কাজ করতে হবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেখে-দেখে। পরে ডিউটি রোস্টার করে দেব তোমার কাজ শেখার পর।
শ্রীলেখা রাজি হয়ে গেল। সে সাত দিন সময় নিল না। তিন দিনেই নিজের কাজ বুঝে নিল। আমি মনে মনে ওর তারিফ ন া-করে পারলাম না। মেয়েটি দেখতেও যেমন সুন্দরী, কাজকর্মেও তেমন চটপটে। ক্রমে ক্রমে আমি ওর ফ্যান হয়ে উঠলাম। কিন্তু পদ-মর্যাদাবোধে বাহ্যিক প্রকাশ করতে পারলাম না। এদিকে শ্রীলেখাও আমার একেবারে একান্ত অনুগত স্টাফ হয়ে গেল। সে দিন ও-টির শেষে স্টোরে যাচ্ছি মালপত্র আনতে--- করিডরে একটি বছর-বাইশের বিবাহিতা যুবতী দাঁ ড়িয়েছিল। দু'জনে দু'জনার কাছাকাছি হতেই মেয়েটি হাত জোড় ক'রে ঠিক শ্রীলেখার মতোই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল--- "সিস্টার মাসি! আমার মাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে? আমি এসেছি--- মা জানে না।" এর পরই পিছন ফিরে কালো মতন লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল--- "কাকু বাবা! তুমি একটু দাঁড়াও, আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে আসছি।"
আমি ও-টি বয়কে বললাম--- "শ্রীলেখাদিকে ডেকে দাও।" স্টোরের কাজ সেরে ফেরার সময় ঐ মুচকি হেসে বলল, কী গো সুমতি, শ্রীলেখার মেয়েকে দেখলে? তার সঙ্গে যে ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোকটা আছে তাকে দেখ নি?

এমন কু-মন্তব্য শুনে আমি জবাব না-দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। নিছক ভদ্রতাবশে জিজ্ঞেস করলাম "কাকে?" সিস্টার উৎসাহিত হয়ে বলল-- ঐ যে শ্রীলেখার মেয়ে অম্বার কাকু--বাবাকে!

আমি চলতে চলতে "না" উত্তর দিয়ে ফিরে এলাম মনে একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে। কিন্তু শ্রীলেখাই সব প্রশ্নের সমাধান করে দিল। টিফিন খাবার সময় চায়ের কাপটা আমার হাতে দিয়ে বলল--- সিস্টার, আমার মেয়েকে দেখলেন? ওর ভালো নাম--- অম্বা। আমি ওকে ঐ নামে ডাকি না। জন্ম থেকেই ও আমার মনা। মেয়ে কোনো কোনো সময়ে বলে--- "মা! এখন আমি বড়ো হয়ে গেছি। কতকাল আর আমাকে মনা বলবে?" কিন্তু কী করব বলুন, আমার মুখে অন্য নামটি আসেই না ও যে আমার সুখের মনা, দুঃখের মনা, শান্তির মনা। আমার চোখের মণি।

আমি হেসে বললাম--- "তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে--আমি তো ভেবেছিলাম তোমারই বিয়ে হয় নি।" অন্য যে-কোনো মেয়েকে এই কথা বললে সে হয়তো খুশিই হত। কিন্তু শ্রীলেখা কেমন মলিন হয়ে গেল।

আমি এর কারণ সে দিন খুঁজে পাই নি। ঘরে ফিরে এসেও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"শ্রীলেখাকে আমি কীই-বা এমন বললাম যাতে ও এতটা আঘাত পেল!"

একদিন শ্রীলেখার অফ্ ডে-তে সেই পুরোনো সিস্টার শিখা চা-টিফিনের সময় আমার কাছে এল। এসে ঢুকতে ঢুকতে বলল "সুমতি, আজ আমি তোমার সাথে টিফিন করব।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, বসে যাও।" শিখা একথা-সেকথা বলতে বলতে শ্রীলেখার প্রসঙ্গে এল। আমাকে জিজ্ঞেস করল-- আজ শ্রীলেখা আসে নি? আমি উত্তরে বললাম--- "ওর আজ অফ--ডে।" মনে হল শিখা যেন আশ্বস্ত হল। বলল--- সুমতি, একটু সাবধানে থেকো। শ্রীলেখা কিন্তু বিশেষ সুবিধের নয়। ও সব সময় ভিজে বেড়ালের মতো থাকে। সাত চড়ে মুখে রা কাড়ে না। ওর পিছনে একটা নাম-করা মস্তান থাকে। ও তার কাছে গিয়ে সব নালিশ করে। শ্রীলেখা নিজে বিধবা তার ওপরে ওর এত বড়ো মেয়ে ঘাড়ে। কিন্তু চাল চলন দেখেছ--- যেন কোনো কিছুতেই ওর পরোয়া নেই।

শিখার এ ধরনের চর্চা আমার ভালো লাগছিল না। আমি গরম চা প্লেটে ঢেলে চুমুক দিতে বিষম খেলাম। শিখাও তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল। আমি আমার কাজে চ'লে গেলাম।

সেটা ছিল রবিবার। আমার ছুটি। ইমারজেন্সি-অন-কল ডিউটি। ঘরে থেকেই জানতে পারলাম ফ্লাটে একটা বড়ো রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং আমার আর রবিবার নয়। ডিউটিতে অন হতে হল। আমি ইচ্ছা করেই শ্রীলেখাকে ওভারটাইম ডেকে নিলাম। কম স্টাফ কাজ বেশি, সুতরাং দৌড়ঝাঁপ করে কাজ চলল। রাত প্রায় শেষ হয়-হয় এমন সময় ডাক্তাররা হাতমুখ ধুয়ে ডক্টরস্ মে বসল। শ্রীলেখা চা নিয়ে এল। আমি ডাক্তারবাবুদের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিলাম। আমাদের চা নিয়ে শ্রীলেখা আমার ঘরে চলে এল। পাশের ঘরে ডাক্তাররা চুটিয়ে আড্ডা মারছে। এ ঘরে আমরা দু'জন নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্পে মজে গেলাম। সেদিন কিন্তু শ্রীলেখা একটু বেশি কথা বলতে শু করল। "সিস্টারদি, আমি আপনাকে অনেক আগেই দেখেছি। আমার স্বামীর মৃত্যুর সময়ে আপনি ঐ হাসপাতালে ছিলেন।" আমি বললাম--- তাই! তা তোমার স্বামী কোন্ হাসপাতালে মারা গেছেন?

শ্রীলেখা উদাস হয়ে জবাব দিল--- কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আমার স্বামীর নাম বাসুদেব দাস। এতদিন পরেও আমি চমকে উঠলাম। বললাম, সত্যিই? তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ! কত বছর আগের ঘটনা, তোমার ঠিক মনে আছে? মনে হল শ্রীলেখা বাইশ বছর পিছিয়ে গেল, ঠিক সেদিনের মতোই বিড়বিড় করে বলল, সে যে আমার সর্বনাশের দিন, তাকে কি ভোলা যায়?

আমার আর সংশয় রইল না। কিন্তু এবার আমার মনেও একটা প্রশ্ন উঁকি মারল--- অম্বার কাকু-বাবা। শ্রীলেখা যেন অন্তর্যামী, সে নিজে থেকেই বলে চলেছে তার মেয়ের ছেলেবেলার কথা, অম্বার কাকু-বাবার কথা মনাকে কোলে নিয়ে লোকের বাড়ি কাজে গেছি--সে বাড়ির পুষরা অনেকেই কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকাত, ভয় পেয়ে চলে আসতাম কাজ ছেড়ে। আবার অন্য বাড়ি যেতাম। কিন্তু কেউ তাড়িয়ে দিত, কেউ বা দয়া করে ডেকে খেতে দিত। পাড়ার ছেলেরা পিছনে পিছনে আসত, খারাপ খারাপ কথা বলত--- ভয় পেতাম। প্রায় ছুটে সরে যেতাম ওদের সীমানা থেকে। আমি যত ছুটতাম--- মনা তত খিলখিল করে হাসত। আমার রাগ হত। পরে বুঝেছি-- মনা ঐ কচি বয়সেই তার মাকে মস্ত বড়ো বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আমি কেমন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। অদ্ভুত ভাবে প্রশ্ন করে বসলাম, মনা! মানে, তোমাকে বাঁচিয়েছে। কী ভাবে?
শ্রীলেখা আবার বলতে থাকল--- একদিন কৈবর্ত পাড়া থেকে ঠিক কাজ সেরে ফিরছি। কে একজন আমাকে অশালীন মন্তব্য করছে, ডাকছে। আমি যতই জোর হাঁটছি ততই মনে হচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছি। আমি ছুটতে শু করলাম। মনা আমার কাঁধে মুখ রেখে হাসছে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখানি বাড়িয়ে অনর্গল বলে চলেছে বা-বা-বা-বা। আমি রোজ কাজ সেরে ফেরার সময় এ রকম যন্ত্রণা ভোগ করেছি কিছুদিন পর্যন্ত।
আমি বললাম-- তুমি কাউকে জানাও নি? সে বলল না, ভয়ে একথা কখনো কাউকে বলতে পারি নি। কিন্তু এভাবে কিছুদিন চলার পরে আমি আর ঐ খারাপ ভাষাগুলো শুনতে পেলাম না। তখন আমার মনে হলো যেন মনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ লোকটাও বলে চলেছে বা-বা-বা-বা। আমিও ধীরে-সুস্থে হাঁটতে পেরেছি। মনার সাথে ও কী করত আমি সামনে চলতে চলতে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু মনা যখন ওকে আর দেখতে পেত না তখন ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠত। আমি মনার কাছে হেরে গেলাম। আর সে-মানুষটাও কেমন পাল্টে গেল। মনা ওর চোখের মণি হয়ে উঠল। সসম্ভ্রমে দূর থেকে আমাকে রক্ষা করতে লাগল অন্যান্য বিপদ-আপদের মুখ থেকে। আমি বেঁচে গেলাম। আমার চি পাল্টালো, একটু একটু ক'রে পড়তে শিখলাম, চাকরি পেলাম। মনা কত কত লেখাপড়া করল। আর সে? সেও আমাদের অভিভাবক হয়ে কাছে চলে এল। একটু থেমে আবার শ্রীলেখা বলল--- জানেন সিস্টার, মনা যতই বা-বা বলত ততই ও খুশি হত। আমি ওর আড়ালে মনাকে কত শিখিয়েছি বল্ মা! কা-কা। মনা হেসে মাথা নাড়িয়ে যেত বা-বা।
রাত ভোর হয়ে গেল। ঘরে ফিরে এলাম মনভরা সন্তোষ নিয়ে। মাসখানেক পরে অম্বা একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে নিয়ে এসে আমার পায়ে প্রণাম ক'রে বলল-- আমি আমার মায়ের বিয়ে দিচ্ছি আমার কাকু-বাবার সাথে। সিস্টার মাসি, তুমি কিন্তু যেয়ো আমার মাকে আশীর্বাদ করতে।
অম্বার মাতৃ-সম্প্রদান। সম্পন্ন হল। পুরোহিত ঠাকুর শ্রীলেখাকে বলল--- "কন্যা-সমর্পিতা-কে নমস্কার করো।"
মুহূর্তের মতো উৎসব প্রাঙ্গণ স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রীলেখা অম্বার পা-দুখানিকে জড়িয়ে ধরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। নিয়নের আলোতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম অম্বার আলতা পরা পা- দু'খানি ভিজে গেছে বাইশ বছরের ধরে রাখা চোখের জলে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com